© 2016 IJNRD | Volume 1, Issue 2 November 2016 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গল্প এক অভিনব সংযোজন

(BANGLA SAHITYE BHOUTIK GOLPO: EK AVINAVA SANJOJAN.)

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

Keyword-

বিষয়- বৈচিত্র্যে অনবদ্য, অলৌকিকতা, রহস্য- রোমাঞ্চময়তায় কাহিনীগুলি রোমহর্ষক|

ABSTRACT:-

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আঙিনায় ভৌতিক গল্পগুলির বিশেষ আকর্ষণ ও গুরুত্ব আছে। এর কারণ সাধারণ মানুষ ভূত বা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন| একথা বলাই বাহুল্য যে ভয়-ভীতি বা কৌতূহল থেকেই ভুতের গল্পের সূচনা বা ভূমিকা নির্ধারণ করা যায়| ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ, জন্মান্তর ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে রহস্যও এই ভৌতিক গল্পের আকর বলা যেতে পারে| তাই বাংলা ছোটগল্পের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ভান্ডারে ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলির অমোখ ও অনিবার্য আকর্ষণ দেখা দিয়েছে| নতুনত্বের দিক থেকেও এই গল্পগুলি বিশেষ ভূমিকা দাবি করতে পারে। গল্পকারেরা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন| এই বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের জন্যই বুদ্ধিপ্রধান, আঙ্গিকসচেতন ও জীবনধর্মী অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি সাহিত্যগুণে গুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এই ভৌতিক গল্পগুলি এতই আকর্ষণীয় যে, গল্পকারেরা এই ধরণের গল্প লেখায় যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছেন| বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের গল্পকারেরা অত্যন্ত সুচারু ভাষায় অভিনব ভৌতিক গল্পের সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন| প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রসময়ীর রসিকতা’য় ভূতের গল্প দিয়ে শুরু হলেও তা শেষপর্যন্ত হাস্যরসে পরিণত হয়| আবার আবুল বাশারের ‘খিলান

নামে কুকুরটি' এক পোষ্য অন্ধ সারমেয়র প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও তাকে একটি মাত্র পাউরুটি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার অক্লান্ত প্রয়াস ভৌতিক গল্প বলে মনে হলেও আদতে মানবিক, করুণরসে সমৃদ্ধ এক মর্মস্পর্শী গল্প। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলীক প্রেমিক' গল্পটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে ভৌতিক আবহাওয়া ও অনুভূতি কিভাবে মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের কারণ হতে পারে। ভূত আছে কি নেই সেই তর্কে না গিয়েও বলা যায় ভৌতিক গল্পের আকর্ষণ কিন্তু অপ্রতিরোধ্য। অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক গল্পের উৎস-সন্ধানে ভারতীয় দর্শন, অধ্যাত্মবাদ, পুনর্জন্ম, জাতিস্মর প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলেও নিছক এডভেঞ্চার ও গল্পের বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই অতিপ্রাকৃত গল্পের সম্ভারে বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর 'দুরাশা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' সেই ভাবনা-চিন্তারই ফসল। রবীন্দ্র-মানসিকতা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিল বলেই গল্পগুচ্ছের আশ্চর্য-উজ্জ্বল, অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে স্বনামধন্য লেখকরা ভৌতিক গল্পের অবতারণা করেছেন। তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, নবনীতা দেবসেন, সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী বসু, লীলা মজুমদার, আনন্দ বাগচী, মঞ্জিল সেন প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অসংখ্য নবীন লেখক ভৌতিক গল্প লিখেছেন।

বাংলা ভৌতিক গল্পগুলি প্রকৃতি, মানব, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, বেদনা নিবিড় প্রেমকাহিনী ও রহস্যময়তায় সমৃদ্ধ। এইসব গল্পের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতি বছর এই ভৌতিক গল্পের বিভিন্ন সংকলন প্রকাশিত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তাও উর্দ্ধগামী। তাই ভৌতিক গল্পের সম্ভারে বাংলা সাহিত্য একটি অভিনব সংযোজনা করেছেন বলা যেতে পারে।।

মূল প্রবন্ধ

পৃথিবীর অপূর্ব সৃষ্টি জলধারা! কখনও বৃষ্টিতে, কখনও নদীতে, কখনও সাগরে, কখনও বা তরলচন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা ঝর্ণায় আত্মপ্রকাশ করে। যে রূপেই সে প্রকাশিত হোক না কেন, তার বহতা ধারা নিত্য ও নৈমিত্তিক। সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষ থেকে পরিণতকাল পর্যন্ত যে ভাব-তরঙ্গের জলধারা তা কেবল সাধারণ জলধারা নয়, তার মাধ্যমে সৃষ্টির গূঢ় নির্দেশও অভিব্যক্ত হয়েছে।

সাহিত্য এই বহতা গতিশীল জীবনধারারই প্রতীক, তা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস যে কোন নামেই অভিহিত করা যেতে পারে। তবে সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক কালের সময়-সংক্ষিপ্তির যুগে বিশাল ব্যাপক মহাকাব্য বা খন্ড কাব্য পাঠের সুযোগ ও রুচি নেই, তাই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে ছোট গল্পে। যার বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস ও আস্বাদ। তাই আধুনিক সাহিত্যের সর্বোত্তম বাহন হল ছোটগল্প। একালের ছোটগল্প সংহত তীব্র সূচীমুখভেদ্য ও বহু রূপ ও বৈচিত্র্যে সুশোভিত। জীবনের একটি খন্ডাংশকে অবলম্বন করে সমগ্রের দ্যোতনা প্রকাশ করা হয়। চকিত আলোর বিদ্যুৎদীপ্তিতে, গহন-গাঢ়--গভীর সত্তার অন্তরলোকে লুক্কায়িত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা -বাসনায় সংসৃক্ত জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই ভাবের আবেদনেই কখনও ইতিহাস, কখনও সমাজ, কখনও ব্যক্তিজীবনের ক্ষণিক মুহূর্ত কখনও বা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। বিষয় বৈচিত্র্যে এবং রীতি প্রকরণের নব নব উদ্ভাবনে বাংলা ছোটগল্পের বিস্ময়কর সমৃদ্ধি ঘটেছে। একটি ঘটনা, একটি অনুভূতি জাগ্রত হয়ে লেখক এর মনকে আশ্রয় করে এবং তা সাহিত্যের রসে জারিত করে হয় একক ও বিশিষ্ট ।

বাংলা ছোটগল্প বিভিন্ন বিষয়ের, ভাবের ও ব্যঞ্জনার যে রসোত্তীর্ণ কালজয়ী সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার মধ্যে অলৌকিক, রহস্যময় অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক গল্পের সম্ভারও অপর্যাপ্ত। কেবল যান্ত্রিকতা বা বাস্তববাদী

বিশ্লেষণই নয়, মনোবিশ্লেষণের যুগান্তকারী অগ্রগতির যুগেও এই অতিপ্রাকৃত বা আধি -ভৌতিক গল্পগুলির আবেদন অনস্বীকার্য। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে এই ভৌতিক গল্পগুলিও, একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জনপ্রিয় এই ভৌতিক গল্পগুলির পটভূমি ও উৎস সম্বন্ধে কিছু কথা জানা প্রয়োজন।

মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ও শক্তিশালী আবেগ হল ভয় এবং সবচেয়ে প্রাচীন ও শক্তিশালী ধরণের ভয় হল অজানাকে ভয়। এই অজানা বিষয় শুধু ভয়ভীতি নয়, তা অপরিসীম কৌতূহলেরও বিষয়। কারণ যতক্ষণ না অজানাকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তার সামনে বিস্মিত ও বিপন্ন বোধ করাটা মানুষ নামক প্রজাতির ধর্ম। ভূতের ভয় উদ্ভূত হয় মূলতঃ এই অজানা ও অদেখা থেকেই। অজানা ও অদেখা এক জগতের প্রতিনিধি হলো ভূত। তাদের অধরা প্রকৃতি এবং তাদের অস্তিত্বকে ঘিরে থাকা রহস্য মানুষের মনে ভয় ও অস্বস্তির অনুভূতি এনে দেয়। এই ভূত নিয়ে মানুষের ঠাট্টা তামাশাও কম নয়। ভূতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুদলই ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ, মনস্ক। 'ভূত' শব্দটির সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাত্মবাদ ও দার্শনিক তত্ত্বটিও যথেষ্ট আকর্ষক। নশ্বর জীবনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে যে কি রূপ প্রাপ্ত হয় তা কৌতূহলের বিষয় বটে, তবে এর মধ্যে দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনাই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। মনুষ্যজন্মের সংস্কার ও প্রারব্ধ মানুষের জীবনপ্রবাহকে সঞ্চালিত করে, সাময়িকভাবে স্তম্ভিত করে, আবার অবলীলায় খন্ডিত করে নতুন দিব্যচেতনায় উন্মেষের জন্য ও মহত্তর পুনর্জন্মের জন্য প্রস্তুত করে। এটাই হলো মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা। এই তত্ত্বের ফলেই ভারতীয় দর্শনে আহূত হয়েছে আত্মার অস্তিত্ব। তাই 'গীতা'য়, পুরাণে, উপনিষদে, জাতকের গল্পে পুনর্জন্ম বা জাতিস্মরের কাহিনী পরিদৃষ্ট হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্ব থাকে কেননা দেহধারী মানুষের স্থূলদেহই শুধু মৃত্যুতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা বা প্রাণের কোন মৃত্যু ঘটে না। এই আত্মা বা প্রাণ দেহ ত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর অন্য দেহ ধারণ করে। কেননা আত্মার মৃত্যু ঘটে না। আত্মাকে ছেদন করা যায় না, অগ্নিদাহন করা যায় না, জলে ভেজানো যায় না, জল একে আর্দ্র করতে পারেনা, বায়ু ওকে শুষ্ক করতে পারে না কারণ

আত্মা অবিনশ্বর, একক, স্পর্শহীন এক অব্যক্ত বস্তু।[১] স্থূলশরীর ত্যাগ করে পরলোক প্রাপ্তি ঘটলেও জন্মার্জিত সংস্কার ও চেতনা ত্যাগ করতে পারে না, তাই স্থূলদেহের অবসানের পর যে প্রতিক্রিয়া তার নাম 'লোক'| ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই লোক বা ক্রমপর্যায়-প্রেতলোক থেকে শুরু করে পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক অতিক্রম করে স্বর্গলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইহজীবনের সুকর্ম বা দুষ্কর্মের ফলে মানুষের আত্মার উন্নতি বা অবনমন ঘটে। তাই পরলোকপ্রাপ্তিতেও মনুষ্য আত্মার স্বরূপ ও মান নির্ণয় হয়। মৃত্যুর পর পরবর্তী জন্মের আগে যে অশরীরী বায়ুভূত আত্মা বা প্রাণের আশ্রয় তাকে প্রেতযোনী বলে। এই প্রেতযোনীর একটি অংশই সদগতিপ্রাপ্ত না হয়ে আশ্রয়হীন অশরীরী অবস্থায় থাকে-তাকেই 'ভূত' বলা হয়। 'ভূত' শব্দটির অর্থ হল যা নেই বা অতীতকাল। এই ‘ভূত’ শব্দটির সঙ্গে একটি ভীতি বা ভয়ের সম্পর্ক আছে। জীবিত মানুষ কখনোই মৃত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না, যদিও প্ল্যানচেট বা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'মিডিয়ামে'র সাহায্য নেয়। তাই মৃত ব্যক্তিকে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করবার জন্যই তর্পণ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিন্ডদান, সোলস্ ডে, সবেবরাত ইত্যাদির মাধ্যমে কেবল স্মরণ করা হয়। এই-ই হলো দর্শন বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের কথা। সাধারণ্যে প্রচলিত লৌকিক ভূত- কাহিনীর বিষয়ই হল আমাদের আলোচ্য।

ভূত বলে আদৌ কিছু আছে কিনা তা তর্কের বিষয়। ভূত থাকুক বা অশরীরী আত্মা থাকুক, এই ব্যাপারটি কিন্তু প্রায় মনুষ্যসভ্যতার সমসাময়িক| যেদিন থেকে মনুষ্যসভ্যতা গল্প বলতে শিখেছে, সেদিন থেকেই ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। ভূত নিয়ে চর্চাও অতি প্রাচীন। যীশু খ্রীষ্ট জন্মানোর প্রায় আঠার'শ বছর আগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় "এপিক অফ গিলগমেশ" বা "গিলগমেশের মহাকাব্য" রচনায় ভূত এবং মৃত্যু পরবর্তী দুনিয়ার উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক ও বিজ্ঞানী প্লিনি দ্যা ইয়ঙ্গার (৬১-১১৩ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর চিঠিতে ভৌতিক আবির্ভাবের কথা লিখেছেন। এমনকি ভূতের মুখোমুখি হওয়ার বিবরণও শুনিয়েছেন। তবে একটি কথা সত্য যে এই ধরণের প্রাথমিক বিবরণগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং উপখ্যানমূলক

প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই রচিত। দলগত ও পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সেরকম কোনও উল্লেখ নেই এসব রচনায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এইসব ভৌতিক বিবরণ ও সাক্ষাতের দাবি নিয়ে অনুষ্ঠানিক বৈজ্ঞানিক তদন্ত শুরু হয়। সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ (এস.পি.আর) এর মত এবং থিওজফিক্যাল সোসাইটির মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয়, এই ভূতপ্রেতচর্চার সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক এমন সব মানুষ সংযুক্ত হন তা জানলে আশ্চর্যবোধ হয়। শার্লক হোমসের স্রষ্টা ডঃ আর্থার কোনান ডয়েল, ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত এবং থ্যালিয়াম পদার্থের আবিষ্কারক স্যার উইলিয়াম কুকস এমনকি বাঙালির কাছে যার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পার্ষদবর্গ, ইলেকট্রিক বাল্ব ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকের জনক টমাস আলভা এডিশন সহ আরও অনেকে এই পরলোকচর্চার সঙ্গে যুক্ত ও বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।[২] ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে গবেষণাপত্রের অভাব তো নেইই, বরং এই বিষয়ে আগ্রহ ও চর্চার আধিক্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকগণ ও প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা যখন এ বিষয়ে আগ্রহ ও চর্চায় মগ্ন থাকেন, তখন সাধারণ মানুষের যে আগ্রহ থাকবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর এক বিপুল সংখ্যক মানুষ ভূতে বিশ্বাস করেন এবং ভূতের ভয়ও পান। প্রশ্ন উঠতে পারে এই ভূতেরা থাকে কোথায় বা তাদের বাসস্থান কোথায়? এর উত্তরের সঙ্গে কিন্তু ভয়ের সম্পর্কও রয়েছে। কোন পরিত্যক্ত পুরনো বাড়ি, জনমানবহীন উন্মুক্ত প্রান্তর, সমুদ্র সৈকত, ঘন বনানী, লাইব্রেরীর গুমটি বইঘর, কোন বন্ধ মিল বা চা বাগান, প্রাচীন চার্চ, অপঘাতে মৃত্যুর কোন স্থান বা বৃক্ষ, প্রাচীন জমিদার বাড়ি বা নাচঘর সবকিছুই ভূত-প্রেতের আনাগোনার পরিসর হতে পারে। এই ভূতুড়ে স্থানগুলির মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তা হলো সবকটি স্থানেই এক বা একাধিক মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছে, তা আত্মহনন হত্যা বা দুর্ঘটনা যাইই হোক না কেন। মৃত মানুষজনের অতৃপ্ত বাসনা কিংবা শেষ সময়ের মানসিক বৈকল্য হয়তো অনাবিস্কৃত এক ডাইমেনশনে পুঞ্জীভূত শক্তির চিহ্ন তৈরি করে ফেলে। সেই বিশেষ শক্তি কিছু ব্যতিক্রমী মানসিকতার ব্যক্তিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাকিরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে নিজেদের কল্পনা মিশ্রিত করে নিজেদের গল্পের জগত তৈরি করে নেয়। তারমধ্যে পূর্বাপর কাহিনী কতটুকু, আর কি পরিমাণে

কল্পনাপ্রসূত-তা বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। একটা সময় সত্য অনুভূতি আর গল্পগুলো একাকার হয়ে একটি জায়গায় বা বিষয়ে ভূতুড়ে তকমা সেঁটে দেয়।আর একবার তা প্রচারিত হয়ে গেলে সে স্থানে যাওয়ার কথা মানুষ চিন্তা করতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি আসে অজানাকে ভয় থেকে। বাস্তবে তাদের হয়তো কিছুই অনুভূতি হয় না। তাছাড়া 'ভূতুড়ে' শব্দটি যদি কোন স্থান বাড়ি বা প্রাসাদের পরিচয় হয়ে ওঠে সেই স্থানে যাওয়ার কথায় মানুষ কল্পনা করে নেয় যে ইন্দ্রিয়াতীত কোন অনুভূতির অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই-উপরোক্ত ধারণা থেকে। আর তা অজানা অচেনাকে ভয় থেকে উদ্ভূত হয়। কিছু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বা ভয়ভীতহীণ মানুষ নিছক কৌতূহলের বশে ওই সব স্থানে যাওয়ার কথা চিন্তা করেন। এমনকি সেই সব স্থান, প্রাসাদ, পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করে। দিল্লির করকরডুমা আদালতের লাইব্রেরীতে বহু মানুষ এক শুভ্রবসনা ছায়ামূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সিসিটিভি ফুটেজেও নানারকম অলৌকিক কীর্তি কলাপ ধরা পড়ার দাবিও করেছেন কর্তৃপক্ষ, যার কোন বাস্তব ব্যাখ্যা মেলেনি। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার বইপ্রেমীদের তীর্থক্ষেত্র ও অলৌকিকতা নিয়ে গবেষকদেরও। গ্রন্থাগারের অলিন্দে লেডি মেটকাফের ভূত ঘুরে বেড়ান, এই তথ্যটি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি বিশ্বাস বলা যায়। অনেকেই এই গল্পের সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখান। লেডি মেটকাফ কারও ক্ষতি করেন না। শুধু দূর থেকে পাঠকদের লক্ষ্য করে যান এবং মাঝে মাঝে টেবিলে ফেলে যাওয়া অবহেলিত বই সযত্নে তাকে তুলে রাখেন। কলকাতার হেস্টিংস হাউসে লর্ড হেস্টিংসকেও অনেক রাতে ঘোড়া চালিয়ে আসতে দেখা যায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়। বিশেষ একটি ঘরে আলমারির তাকে বিশেষ কোনো কাগজপত্র খুঁজতে পাওয়ার শব্দ পাওয়া যায়। গুজরাটের 'দামাস' সমুদ্র সৈকতের কুখ্যাতি হল কালো বালির এই সৈকতে পর্যটকদের পা ধরে কেউ যেন বালির গভীরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। এই অনুভূতি প্রচুর মানুষের হয়েছে। তাই সমুদ্র সৈকতটিও পরিত্যক্ত হয়েছে। উত্তরপূর্ব রাজস্থানের আলওয়ার জেলার ভানগড় কেল্লার কথাও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। কেল্লা বা দূর্গের ওই তৎ-পার্শ্ববর্তী সারি সারি কামরাগুলির মাথায় ছাদ নেই। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে ভানগড় কেল্লার নির্মাণ। অম্বর রাজ্যের রাজা ভাগবন্ত দাস তাঁর পুত্র মাধো সিং এর জন্য এই কেল্লা বা দুর্গ তৈরি করেন। মাধো সিং

ছিলেন সম্রাট আকবরের নবরত্ন এর অন্যতম মান সিংয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাধো সিং এর এক পৌত্র আজব সিং ভানগড়ের সন্নিকটে আজবগড় কেল্লার নির্মাণ করেন। পারস্পরিক বৈরিতার জন্য আজবগড় ও ভানগরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকতো। স্থানীয় লোককথার মতে আজব সিং-এর সৈন্যদের হাতেই ভানগড়ের ধ্বংস হয়। যুদ্ধের গ্রাসে প্রাণ যায় সাধারণ মানুষের। বাকিরা বাসা শূন্য করে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পরাজিত ভানগড়ের রাজ পরিবারকে চোরাকুঠুরির মধ্যে বন্দী রাখল আজবগড়ের সেনা। রাজকন্যাকে আটকে রাখল প্রাসাদের প্রান্তে আলাদা একটি ঘরে। স্থানীয়রা বলেন আজও প্রতিদিন গভীর রাতে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রাজকন্যা রত্নাবতী। তাঁর নূপুরের শব্দ শোনা যায় নিস্তব্ধ প্রাসাদ থেকে। সারারাত ধরে অস্থির নূপুরধ্বনি প্রাসাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ায়। দূর্গ থেকে কান্না আর হাহাকারের শব্দ ভেসে আসে। গ্রামের বর্তমান মানুষজন ভয়ে সন্ধ্যার পরে পথে বেরোয় না। দূর্গের মধ্যে বিরাট গাছগুলির মধ্যে একটিতে তেল সিঁদুর লাগিয়ে এই ভূত বা অপদেবতার পূজা অর্চনা চলে, যাতে গ্রামের লোক শান্তিতে থাকেন। এমনকি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ ডিপার্টমেন্ট (আর্কিওলজি) সাইনবোর্ড দিয়ে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পরে পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে দূর্গে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে।[৩] এই ইতিহাস কিন্তু বিস্তারিতভাবে দলিলবদ্ধ নয়। ১৮৭৮ সালে সাহেবদের প্রকাশিত পত্রিকা "গেজেটিয়ার অফ আলোয়ার"-এ এই ইতিহাসের আভাস রয়েছে। ভানগড়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বাকি দুটি লোকগাথারও অলৌকিক উপাদান বর্তমান রয়েছে। দার্জিলিং এর কাছে কালিম্পং জেলার মর্গ্যান হাউসও ভূত বাংলো নামে কুখ্যাত। হিমালয়ের পাদদেশে ছোট শহর কালিম্পং। তিস্তা নদীর এক দিকের তীরে গড়ে উঠেছে এই শহরটি। ব্রিটিশ শাসনকালে সুন্দর আবহাওয়ার কারণে এই জায়গাটি ইউরোপীয়দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ধনী ব্যবসায়ী জর্জ মর্গ্যান পাহাড়ের ঢালে ষোল একর জমির উপর এক অতি সুদৃশ্য বাংলো নির্মাণ করেন সস্ত্রীক বাস করবেন বলে। ১৯৩০ সালে নির্মিত এই বাড়িটির চারিদিকে প্রশস্ত লন, কেয়ারী করা বাগান, সুন্দর দুষ্প্রাপ্য বড় বড় গাছ আর উদার আকাশের প্রেক্ষাপটে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতের চূড়া যেন অপূর্ব কাব্যগাথার মতো মনোরম। বাংলোর অন্দরসজ্জাটিও ঔপনিবেশিক আভিজাত্য ও রুচির পরিচয় দেয়। তবে এই সাধের বাংলোতে জর্জ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী বেশিদিন

সুখে বাস করতে পারেননি। মিসেস মর্গ্যান আচমকাই একদিন মারা যান। কেউ বলে আত্মহত্যা, আবার কেউ বলে খুন। প্রকৃত সত্যটা যে কি কেউ জানে না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মর্গ্যান সাহেব এ দেশ ছেড়ে চলে যান। বহুদিন বাংলোটি খালি পড়ে ছিল। তারপর রাজ্য সরকার এটি অধিগ্রহণ করে, সংস্কার করে এখন হেরিটেজ হোটেল হিসেবে ব্যবহার করে। পর্যটকরা এই বাংলোতে রাত কাটিয়ে গত শতাব্দীর ঐতিহ্যের স্বাদ গ্রহণ করে। তবে এই পর্যটকের অনেকেই এই বাংলায় কিছু অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন| তারা বলেন, মিসেস মর্গ্যান নাকি আজও এই বাংলোর মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। আজও কোন কোন রাতে কাঠের সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ শুনেও ভুলে দরজা খুললেই বিপদ। মোমবাতি হাতে এক অপরূপ সুন্দরী নারীশরীর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর অতৃপ্ত আত্মা প্রতিটি ঘরের আনাচে-কানাচে হারানো সুখ খোঁজে ফেরে আজও। আবার কখনো লম্বা করিডরের বাঁকের মুখে হাস্যমুখী নারীমূর্তি দেখা যায়, যা অচিরেই মিলিয়ে যায়।[৪]

কলকাতায় অবস্থিত পুরনো আকাশবাণী ভবন অর্থাৎ গ্যাসটিন প্লেস এ বিষয়ে অর্থাৎ ভৌতিক ব্যাপারে বিশেষ দাবী করতে পারে। এই ভবনে ভূতের অস্তিত্ব অনেকেই অনুভব করেছেন বা দেখেছেনও। বহু শিল্পী, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা এই ভূতের কার্যকলাপ অনুভব করেছেন। তবে এই ভূত কারও কোন ক্ষতি করেনি। সেই ভূত সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র ভালবাসে। বহু বিশিষ্ট মানুষের সাক্ষাৎকারে এই গল্প শোনা গিয়েছে।[৫] পাটনার আলি বক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী বা মুম্বাইয়ের কোলাবা মিলস্‌ও এরকম ভৌতিক কাহিনীর আকর।

একটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন যে ভূতেরও নানা প্রকার নাম আছে। ভূত, মামদো, পেত্নী, শাকচুন্নি, ব্রহ্মদত্যি ইত্যাদি। তাদের আবাসস্থল শ্যাওড়া গাছ, বেলগাছ, মেছো হাটা, মাঠ প্রান্তর, পুরনো বাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া গ্রামে গঞ্জের বহু জায়গা।

বাংলা ছোটগল্পের বৃহৎ পরিসরে ভূতের গল্পেরও বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখকদের অবদানও কম নয়। হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সর্বোপরি আমাদের সর্বজনধন্য রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। এছাড়া অসংখ্য লেখক ভৌতিক গল্পের সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রথমেই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভগিনী কাত্যায়নী এক ভূত বা অপদেবতার প্রভাবে অসংলগ্ন আচরণ ও কার্যকলাপ করতে থাকে। পিতা ক্ষুদিরাম কন্যার সমীপে গমন করলে কাত্যায়নীর দেহে ভর করা প্রেতাত্মা বলল যে সে অপঘাতে মৃত্যুর এক দুঃখী ভূত। তাই যদি কেউ গয়ায় পিণ্ডদান করে তাকে মুক্তি দেয়, তবে ভালো হয়। ক্ষুদিরাম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কন্যার কল্যাণের আশায় প্রেতের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে তিনি গয়ায় পিন্ডদান করবেন। যথা নিয়মে গয়াধাম যাত্রা করে সেই প্রেতাত্মার পিন্ডদান করলেন। প্রেতাত্মার কথা মত কাত্যায়নীর বাড়ির সামনে একটি নিম গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছিল। তাতেই বোঝা গেল, প্রেতাত্মা কাত্যায়নীর দেহ ছেড়ে চলে গেছে। কাত্যায়নী তারপর সুস্থ হয়ে ওঠে। এটি একটি সত্য ঘটনা।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রও একটি ভূতের গল্প লিখেছিলেন। "নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী" নামে একটি গল্পের সূচনা করেছিলেন। ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা আরও গল্পের আশা করেছিলাম।

হাস্যরসের স্রষ্টা পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও ভৌতিক গল্পের অন্যতম স্রষ্টা বলা যায়। রাজশেখর বসুর "ভূশন্ডির মাঠ" বাংলা ভৌতিক গল্পের এক স্যাটায়ারধর্মী গল্প। ভৌতিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পটির মূল আধার হাস্যরস হলেও গল্প বলার ধরণে ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়েছে।

"যাহারা স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় না। প্রকৃত তথ্য এই যে, নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পরে ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিং রুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয় লাভ করেন। সাহেবরা বিনা পাসে ওয়েটিং রুম ছাড়িতে পারেনা। হিন্দুর জন্য অনুরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, নির্বাণ, মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্রতত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ অল্প দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ বা দশ বিশ বৎসর পরে কেহ বা দু-তিন শতাব্দী পরে। যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে কাশী লাভ হয় তাঁহারা সূক্ষ্ম শরীরে হালকা ঝরঝরে থাকেন, যাঁহারা সকৃত পাপের বোঝা ঋষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে —একেবারেই মুক্তি।"[৭]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বৈঠকী সরস গল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যটিকে ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। ভৌতিক আধারে লিখিত গল্পগুলিতে লেখকের ভাষার সারল্য, সরসতা , ও রচনারীতির কুশলতা আছে। তাঁর রচিত ভূত ও মানুষ, ডমরুচরিত, ভূতের বাড়ি প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় লেখা।

"যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচ হইতে ঠিক জীবন্ত মানুষের রক্তমাংসের হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে গেলাম। খপ্ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর একজন পুরুষ, বালক, বৃদ্ধা নানা প্রকার আকার ঘরের ভিতর আবির্ভাব হইতে লাগিল ও একে একে বিলীন হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করতে লাগিলো। আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেবার জন্য মাঝে

মাঝে ঘাড়েও হাত আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বারবার সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য কথা।"[৮]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃস্ফূর্ত জীবনরসের গল্পকার। তাঁর 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'কিন্নরদল', 'পৈতৃক ভিটা', 'গায়ে হলুদ' প্রভৃতি গল্পে ভৌতিক ভয়াবহতা নেই বটে, তবে রহস্যময়তাই প্রধান হয়ে গল্পগুলিকে স্বাদু ও সজীব করে তুলেছে।

মনোজ বসুর গল্পগুলিতে অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা জীবনের সরস উপস্থাপনা ভৌতিক গল্পগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। তাঁর "ভূত মরে পাঁঠা" গল্পটি একটি ব্যতিক্রমী ভূতের গল্প। ভূত মরে পাঁঠা হয় ও নটবর সেই পাঁঠাকে ধরে গঞ্জের হাটে মানুষের কাছে বিক্রি করে। তার ভূত শিকারও আশ্চর্যজনক ঘটনা বটে।[৯]

ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে রানীগঞ্জ-উখড়া-ধানবাদ প্রভৃতি কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার প্রথম বাস্তবচিত্র পরিবেশনের জন্য বিখ্যাত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখিয়েছেন। তাঁর "ভূতুড়ে খাদ" গল্পটিও জীবনকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখবার যে ভঙ্গি তাতে রসাস্বাদের যে প্রবৃত্তি তাতে সাহিত্যের রিয়ালিজমের সঙ্গে মানবিকতার সমন্বয় ঘটে। খনিগর্ভে নিহত সাঁওতাল শ্রমিকদের যে দুঃখজনক ঘটনা, দুঃখী খনিমজুর পিতার পুত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা, ভূত হয়েও তার অন্যথা হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশীর সাধনা প্রায় সর্বতোমুখী। মূলতঃ রুক্ষ, কঠিন পরিহাসপ্রিয় শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত প্রমথনাথ বিশী ভৌতিক গল্পের আবহাওয়ায়ও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর 'ডাকিনী', 'অশরীরী', 'অভাবিত'

প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত গল্পের শিহরণ জাগায়।'অভাবিত' গল্পে এক তরুণ দম্পতি মোটর গাড়িতে করে বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ও উভয়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু তারা তা বুঝতে না পারায় প্রায় দুশো বছর পিছিয়ে যায় ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের ভুল ভাঙে ও বুঝতে পারে যে তারা আর বেঁচে নেই। অত্যন্ত সজীব ভাষায় লেখা ভৌতিক গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।[১০]

কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু ছোটগল্পকার হিসেবে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। আবেগ ও ভাবালুতা বর্জিত বুদ্ধিপ্রধান জীবনধর্মী এই লেখকরাও ভৌতিক গল্পের উপহার দিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'অলিখিত দলিল' প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'কলিকাতার গলিতে' ও বুদ্ধদেব বসুর 'দুই বন্ধু' পড়লেই বোঝা যায় যে জীবনমুখী কঠিন বিষাদই নয়, অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধেও তাঁদের স্বচ্ছ ধারণা ছিল। ভ্রম বা স্বপ্ন যাই হোক না কেন কলিকাতার গলিও নির্দোষ নয়। আবার 'দুই বন্ধু' নিছক গল্প নয়। অন্তরঙ্গ দুজন বন্ধু কি অদ্ভুত মানসিকতা ও ঈর্ষায় বন্ধুকে হত্যা করার মতো জঘন্য ষড়যন্ত্র করে, অবশেষে সে নিজেই বিষপান করে, পরে বন্ধুটিও আত্মহত্যা করে বন্ধুর সমগামী হয় তারই করুণ ও মর্মান্তিক গল্প।[১১]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীহাররঞ্জন গুপ্ত মূলত রহস্য-রোমাঞ্চ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক, কিন্তু ভৌতিক বা অলৌকিক গল্পের বিষয়েও তাঁরা সিদ্ধহস্ত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প 'সবুজ চশমা' কিউল স্টেশনের পটভূমিকায় রচিত। এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত একটি চশমাও কাহিনী রসকে কতখানি মনোগ্রাহী করে তুলতে পারে এ গল্প তার প্রমাণ। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'আকস্মিক' গল্পটি একটি বর্ষণমুখর রাতে বন্ধুদের সান্ধ্য আড্ডায় সদ্য প্রয়াত বন্ধু বিভূতির আগমন ও বন্ধুদের আশ্চর্যান্বিত করে নির্গমন এক ভৌতিক পরিবেশের জন্ম দেয়।[১২]

ভৌতিক গল্প লেখায় লেখকরাও অংশগ্রহণ করেছেন। লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, নবনীতা দেব সেন, মহাশ্বেতা দেবী প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখিকারাও এই শ্রেণীর গল্প লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর "লোকসান না লাভ", নবনীতা দেব সেনের "স্বপ্নের মত", লীলা মজুমদারের "গোলবাড়ির সার্কিট হাউস" গল্পগুলি ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ 'স্বপ্নের মত' র অদৃশ্য শক্তির গা ছমছমে পরিবেশ ও অদৃশ্য ভৌতিক কান্ড কারখানা এক অন্য মাত্র এনে দেয়। টেলিফোনের বেল বাজা, জাপানি গার্ডেনের আলো জ্বলা-নেভা, ডায়নামোর আওয়াজ, সুইটে অদ্ভুত ঝিম ধরানো এসেন্সের গন্ধ, পাঠকের মনে এক ভীতির সঞ্চার করে। বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ছন্দা বাগচী, অনিতা অগ্নিহোত্রী, অরুনিমা রায়চৌধুরী, দেবযানী বসু কুমার, বীথি চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুগঠিতভাবে ভূতের গল্পগুলি লিখেছেন। বাণী বসুর 'মোচার ঘন্ট', অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'ভুতের মানুষজন্ম' গল্পগুলি মানবিক রসে সমৃদ্ধ ও রহস্যাবৃত। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'লাচুংয়ের ভুপিন্দর সিং' ভৌতিক রহস্য সৃষ্টিতে অতুলনীয়। মৃত গাড়ি চালক ভূপিন্দর সিং আজও লাচুং এর পথে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালায় এবং সেই গাড়িতে কেউ চড়লে তার সমূহ বিপদ। পরিবেশ ও ভৌতিক পরিবেশনায় গল্পটি অনবদ্য স্বাদের জন্ম দিয়েছে।[১৩]

ভৌতিক গল্পের লেখকদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় অন্যতম। তাঁর বিবিধ ভৌতিক গল্পের মধ্যে 'ভৌতিক চক্রান্ত' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কলকাতা শহরে সস্তায় বাড়ি ভাড়া পাওয়ার লোভে চিত্রশিল্পী প্রমোদের ভূত সাজা ও ক্ষেত্র মল্লিককে বোকা বানিয়ে কার্য হাসিল করা ভূতের ভয়ংকরতার থেকেও হাস্যরসের আবহ তৈরি করে।

ছোটগল্পের অন্যতম ভিন্নধর্মী গল্পকার বিমল কর ভৌতিক গল্প লেখায়ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর অসংখ্য ভৌতিক গল্পের মধ্যে 'কেউ কি এসেছিলেন' গল্পটি একটি আশ্চর্য রহস্যময় ভৌতিক গল্প। নির্জন স্টেশনের

অফিস ঘরে এক আগন্তুক ভদ্রলোক ডাক্তার পরিচয় দিয়ে দুদিন অপেক্ষা করেছেন। তিনি কে, কি তার উদ্দেশ্য বোঝা গেল না। শুধু একটি ভৌতিক গল্পের অবতারণা করে গেলেন।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চমুন্ডির আসন' অপ্রাকৃত গল্পটি লিখে ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও অসাধারণ। কমোলি সিদ্ধেশ্বর চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু অপ্রাকৃত বা অলৌকিক নয়, এ গল্পের সাহিত্যমূল্যও যথেষ্ট। গ্রামের পরিবেশের স্নিগ্ধতা ও বর্ণনাও গল্পটিকে অন্য মানবিক মাত্রা দিয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভৌতিক গল্পে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিশ্বমামা ও বেড়াল ভূত', 'ডাকবাংলোর হাতছানি', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'নির্জন ষ্টেশনে', 'গোঁসাই বাগানের ভূত' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাচ্চা ভূতের খপ্পরে' প্রভৃতি গল্পগুলি অসাধারণ ভৌতিক গল্প। 'ডাকবাংলোর হাতছানি' গল্পে বিনয় বাবু প্রয়াত হয়েও ডাকবাংলোর মায়া কাটাতে পারেননি। তাই বারবার হোটেলের বোর্ডারদের কাছে দেখা দেন, তবে তিনি কারও ক্ষতি করেন না। [১৪]

রাঢ়বঙ্গের জীবনযাত্রার আদিম ক্ষয়িষ্ণুতা ও সামাজিক শক্তির সংঘাতের বিচিত্র রসের গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেদেনী', 'জাদুকরী', 'ডাইনী' গল্পের মাধ্যমে এক অতিপ্রাকৃত ও আধিভৌতিক গল্পের অতারনা করেছেন। 'ডাইনী' গল্পের পিঙ্গল তারার সেই মেয়েটি যাকে গ্রামসুদ্ধ লোক ডাইনী বলেই জানতো, ছাতিফাটা মাঠের মাটির ঘরে একান্তবাসিনি নারীটি এক মানসিক অস্থিরতায় কালক্রমে এক সামাজিক অভিশাপ ও অবিচারের শিকার হয়েছিল তারই মর্মান্তিক কাহিনী এ গল্প।

"লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু কামনা করিল, জনা কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝর্ণাটার কাছে আসিয়া জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মতো ফুঁসিয়া উঠিলো—আকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে একসময় চিলের মত চিৎকার করিয়া উঠিলো তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চিৎকার শুনিয়া ছেলেরা পলাইয়া গেল কিন্তু এখনও সে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনো বা ক্রুদ্ধ চিৎকারে ঐ ছাতি ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছে হইতেছে বুক চাপড়াইয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া, পৃথিবী ফাটাইয়া হাহা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ কোন দরকার নাই। এখনই একটা গোটা শিশুর রক্ত অদৃশ্য শোষণে সে পান করিয়াছে।"[১৫]

সমরেশবসুও অনেক ভূতের গল্প লিখেছেন। তাঁর 'অদৃশ্য মানুষের হাতছানি' একটি বিখ্যাত গল্প। গোগোল নামের ছোট ছেলেটি বাবা মার সঙ্গে দার্জিলিং এ বেড়াতে যায়। সেখানে একটি জরাজীর্ণ খাকি রঙের মিলিটারি পোশাক পরা লোককে সে প্রায়ই দেখতে পায় অথচ অন্যরা দেখতে পায় না। সেই লোকটি গোগোলকে খাদের কাছে নিয়ে যায়, পরে সেই মৃত্যু-বিভীষিকাময় খাদের পাশ থেকে গোগোলকে উদ্ধার করা হয়। জানা যায় লোকটি ওই গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার ময়লি দিদির বাবা, যিনি চার-পাঁচ বছর আগেই মারা গিয়েছেন। মৃত মানুষ কখনও কখনও জীবন্ত মানুষের দেহ ধারণ করে বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রহস্য রোমাঞ্চ-গল্প অনেক লিখেছেন। তাঁর ভূতের গল্পের খ্যাতিও কম নয়। 'ভূতুড়ে বিড়াল' ও 'হরির হোটেল' অত্যন্ত জনপ্রিয় গল্প। কাঞ্চনপুরে বন্ধুর বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য ট্রেন থেকে নেমে সাইকেল রিক্সা বা টোটো যখন পাওয়া গেল না তখন অসহায় লেখক হরির হোটেলে গিয়ে ভরপেট ডাল-ভাত-মাছ খেয়ে গন্তব্যস্থানের দিকে রওনা দিল। পথে যে ভৌতিক উপদ্রবের সম্মুখীন হতে

হয় তারই কাহিনী এই হরির হোটেল। শেষ পর্যন্ত ভৌতিক উপদ্রবকে জয় করে নির্মলের বাড়িতে উপস্থিত হন। গল্পের গতি ও ভাষার সজীবতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মঞ্জিল সেন ভূতের গল্পের অন্যতম লেখক। তাঁর ‘সাহেব ভূতের আংটি’ বা ‘বিলাপী আত্মা’ গল্পগুলি এক বিশেষ অনুভূতির জন্ম দেয়। ফাঁসির আসামি ম্যাথিউসের অতৃপ্ত আত্মা শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার পিল্লাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ও নিজের অপরাধ স্বীকার করার জন্য পাদ্রীকে যোগাযোগ করতে বলে। প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ডক্টর পিল্লাই ওয়ার্ডার ও পাদ্রী বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে ম্যাথিউসের আত্মাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। খুনের আসামি হতভাগ্য ম্যাথিউস নিজের কৃতকর্মের কথা পাদ্রীকে বলে ও সে যে প্রকৃতই এসেছে তার প্রমাণ স্বরূপ অস্পষ্ট মূর্তি হয়ে দেখা দেয় ও ফাঁসির দড়িটি দিয়ে যায়। তার অপরাধ স্বীকার ও তৎপরবর্তীতে দড়িটি উধাও হয়ে যাওয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পারলৌকিক বিষয়ে ডাক্তার পিল্লাই এর অনেক পড়াশোনা আছে-

"তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে মুক্তি পায়নি এমন আত্মা একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানেই উপস্থিত হয়। বিশেষ করে সেই আত্মা যদি বিশেষ কোনো সাহায্য প্রার্থী হয়। ম্যাথিউসের আত্মা যে একটা যন্ত্রণায় ভুগছে এবং সেই বিষয়ে তাঁকে কিছু বলতে চায় তা তিনি অনুভব করেছিলেন। এই অনুভূতি তাঁর আগেও হয়েছিল। আকস্মিক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এমন সব মানুষের শবব্যবচ্ছেদের সময় তিনি বিদেহী কারও উপস্থিতি অনুভব করে অসহায় বোধ করেছিলেন। আত্মার বিনাশ নেই এ মতবাদে তিনি বিশ্বাসী। হয়তো দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেয় না, হয়তো আরও কিছুদিন সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। বিদেহী আত্মা যে জীবিত মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম সে কথা ডাক্তার পিল্লাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। এসব মুক্তি না পাওয়া বা অতৃপ্ত আত্মা পৃথিবী ছেড়ে যত ওপরে উঠতে থাকে এই ক্ষমতাও ততই কমে যেতে থাকে তবে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রথম দু একদিন ওটা দুর্বল থাকে। কারণ নতুন অবস্থা ও পরিবেশ মানিয়ে নিতে সময় লাগে। তাই ডঃ পিল্লাইয়ের ধারণা হয়েছিল আজও হয়তো তিনি টেলিফোন স্পষ্ট

কিছু শুনতে পারবেন। ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। গত রাতের মত অত ক্ষীণ নয়, আবার সাধারণভাবে বাজার মতও নয়।"[১৬] ঘটনা পরম্পরা, ভৌতিক পরিবেশ ও বিশ্বাসযোগ্যতায় গল্পটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

অদ্রীশ বর্ধন ও অনীশ দেব ভৌতিক ও রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের একটি বিশিষ্ট নাম। অদ্রীশ বর্ধনের 'আদিম আতঙ্ক'-এ একজন মহিলা ডাক্তারের বিচিত্র অনুভূতি ও আতঙ্কের শিহরণ পাঠকমনেও শিহরণ জাগায়। ডাক্তার মাধবী লাহার নৈঃশব্দ্যের যে অতলান্ত অনুভূতি পরবর্তীকালে একটি হত্যাকান্ডের সম্মুখীন করে, যা মানুষের বিচারে নিছক হত্যাকাণ্ড নয় বরং তা ভৌতিক কান্ডের পরিণাম বলেই মনে হয়।

অনীশ দেবের 'জলের মতো কঠিন' গল্পে গ্রামের বিজয়ী সংঘের এক নম্বর ফুটবলার পবনের ডাকাত ধরতে যাওয়া, পরিণামের মৃত্যু এবং তারপরও ভূত হয়ে ডাকাতদলের মোকাবিলা করা এক আশ্চর্য ভৌতিক আবহের জন্ম দেয়। ডাকাতদের জব্দ করার ডুবপুকুরে পবনের অন্তর্ধান একটি বিস্ময় ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শক্তিপদ রাজগুরু ও জরাসন্ধের মতো প্রথিতযশা লেখকও ভৌতিক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। শক্তিপদ রাজগুরুর 'ছায়া মূর্তি'-তে এক শিল্প নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জার্মান ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার টমসম্যান আগের পোশাকে সমগ্র লৌহ নগরী পরিদর্শন করেন। লেখকের চোখে যা বিস্ময় ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে।

জরাসন্ধর 'নিজাম কাঁদির বিল' এক অলৌকিক গল্প যার ভয়াবহতা ও কৌতূহল পাঠকের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার করে। এই বিলে কোন মাঝি রাতে সঠিক পথে যেতে পারে না। মাঝিদের দিক ভুল হয়ে যায়। তবুও নিজাম কাঁদি লেখক কে নির্দেশ মত জায়গায় পৌঁছে দেয়।

বিমল মিত্র ও হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্পগুলি যথেষ্ট আকর্ষক। বিমল মিত্রের 'রাত তখন এগারটা' গল্পে মৃত নসু কাকু কিভাবে লেখককে নিশুতি রাতে পথ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন তার অত্যাশ্চর্য কাহিনী।

সত্যজিৎ রায়ের 'রতন বাবু আর সেই লোকটা' একটি মনস্তাত্ত্বিক ভৌতিক গল্প। গল্পটির আকস্মিকতা ও বলার ভঙ্গিটি অতুলনীয়।

নবীন লেখকদের মধ্যে প্রফুল্ল রায়, আবুল বাশার, শানু ঘোষাল, আনন্দ বাগচী, রূপক চট্টরাজ, সায়ন্তনী পুততুন্ড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সায়ন্তনী পুততুন্ড'র 'তৃষ্ণা' গল্পটি ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হলেও তার পরিবেশ ও পটভূমিকা বীভৎস আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

"দৃশ্যটা দেখে অতীনের রক্ত হিম হয়ে গেল। জলমহলের ছাতের জমাট অন্ধকার ফুঁড়ে অতিকায় দেহের কী যেন একটা বেরিয়ে আসছে। এমার্জেন্সি আর টর্চের আলোয় ধরা পড়লো সেই অদ্ভুত প্রাণী। মাথাটা অবিকল মানুষের মাথার মতো গোল। চোখ নাক মুখ সবই আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো হাত ও দুটো পা। কিন্তু সারা শরীর যেন রক্তহীন। ফ্যাকাসে চামড়ায় পচনের ছাপ।মাথা , নাক, মুখে রক্তের কালচে ছোপ লেগে আছে। দুই হাতে ভর দিয়ে ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। ওদের তিনজনকে যেন মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো। পরক্ষণেই তীব্র একটা গর্জন করে উঠলো। রক্ত জল করা সে গর্জন। কোন রক্তপিপাসু বন্য প্রাণীর গর্জন ও বোধহয় এত ভয়াল নয়। তার নিষ্ঠুর চোখ দুটোয় আলো পড়তেই ঝিকিয়ে উঠলো। সেই ফাঁকে তার নিষ্ঠুর ও ধারালো দন্তপংক্তিও দেখা গেল। স্বদন্তে লেগে আছে রক্ত। এই-ই তবে পিশাচ? ওরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।"[১৭]

বাংলা সাহিত্যে ভূতের গল্পের সমারোহে যে ব্যক্তিত্বময় লেখকের নাম সোনার অক্ষরের লেখা থাকবে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'জীবিত ও মৃত', 'কঙ্কাল', 'মনিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা' প্রভৃতি গল্পে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব পড়েছে। প্রকৃতির অন্তঃপুরে যথার্থভাবে প্রবেশ করতে শিখলে অতিপ্রাকৃতের লীলাময়তা অনুভব করা যায়। এই অপ্রাকৃতের চেতনা অলক্ষিত পথে মানবহৃদয়ে মানবচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট করে ব্যাপক সংক্রমণে সমস্ত স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিকে বিস্মিত ও ভয়চকিত করে তোলে। বাঙালির পরলৌকিক বিশ্বাস ও দৈবশক্তি, অতিপ্রাকৃত তথা জন্মান্তরের সম্পর্কে সংস্কার এই রহস্যময়তা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই অপ্রাকৃত কুয়াশায়, মনস্তত্ত্বের রৌদ্রছায়ার খেলার কয়েকটি বিখ্যাত গল্প তিনি পরিবেশন করেছেন। সাধারণত প্রেম ও সৌন্দর্যমুগ্ধতা বিপথে চালিত হলে মানসিক বিভ্রান্তি ঘটে। এই বিভ্রান্তি কখনও কখনও প্রেতলোকের অনুভূতিকে প্রবল করে তোলে। মৃত্যুজনিক ব্যবধান এই মানসিক আলোড়নকে প্রবলতর করে তোলে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' এমনই একটি বিস্ময়কর অতিপ্রাকৃত গল্প। সৌন্দর্যপিপাসায় বিকারগ্রস্ত একটি কল্পনাপ্রবণ তরুণ হৃদয়ের কামনামদির প্রাসাদকক্ষের রহস্যময় পরিবেশে আপাত বিলুপ্তিই গল্পটির বিষয়বস্তু। গল্পটি অলৌকিক ভৌতিক অনুভূতির সঞ্চার করে। কোনও অবিশ্বাস্য বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাক্রমের দ্বারা এই ভৌতিক অনুভূতির সৃষ্টি করা হয়নি। বরং সূক্ষ্ম মানোবিকলনের পথে এই মোহাবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। গল্পটির কাঠামোও একান্তভাবেই বাস্তব। ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষার অবসরে কোলাহল মুখর স্টেশনের বিশ্রামগৃহে এই রোমাঞ্চকর গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের এই টেকনিক ও নাটকীয় শিল্পসমৃদ্ধ পরিসমাপ্তি কল্পনাতীত প্রতিভার পরিচায়ক।

বাঙালির পারলৌকিক বিশ্বাস ও অপ্রাকৃত রহস্যময়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল। বাল্যকালে ও যৌবনে বহুবার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে প্ল্যানচেট নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কখনও কৌতুকছলে, কখনও বা কৌতূহল বশে। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল যে, যে বিষয়ে প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না সে বিষয়ে মন খোলা রাখাই উচিত। যেকোনও একদিক ঝুঁকে পড়াটা গোঁড়ামি। এই অপ্রাকৃত মনস্তত্ত্বের

রৌদ্রছায়ার খেলায় কয়েকটি বিখ্যাত গল্প তিনি লিখেছেন। 'দুরাশা' গল্পে একটি মুসলমান নবাবনন্দিনী একজন হিন্দু রাজপুরুষের পানিপ্রার্থী হতে চায়। এই প্রেম ছিল একপক্ষীয়। ব্রাহ্মণ সেনাধিনায়ক কেশরলাল নবাবপুত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু নবাবনন্দিনী মেহেরউন্নীসা তাকে ভুলতে পারেনি। সে নারীর স্বাভাবিক লজ্জাশরম ভুলে পথে পথে তার মনের মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার আজকের এই করুণ অবস্থার জন্য ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধও অনেকটা দায়ী বলে সে মনে করে। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহে অসংখ্য ভারতীয় সৈন্য ও দেশপ্রেমিক রাজন্যবর্গ প্রাণ হারিয়েছিলেন। কেশরলালও গুরুতর আহত হয়েছিল। এদিকে মেহেরউন্নীসা তার প্রেমিককে খুঁজতে খুঁজতে রণক্ষেত্রের অদূরে কেশরলাল ও তার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনকে অর্ধমৃত অবস্থায় দেখতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কেশরলালের সম্বিৎ ফিরে আসে ও জল পান করতে চায়। মেহেরউন্নীসা জল দিলেও কেশরলাল জানতে পারে যবনী মেহেরউন্নীসা তাকে জল দান করেছে। কেশরলাল তাকে তীব্র পদাঘাত করে স্থান ত্যাগ করে ও একটি খেয়া নৌকায় চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। মেহেরউন্নীসাও কেশরলালের সান্নিধ্য পাবার আশায় পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে-মন্দিরে ভ্রমণ করেছে কিন্তু কেশরলালের সাক্ষাৎ পায়নি। আটত্রিশ বছর পর দার্জিলিঙে এসে ভুটিয়া স্ত্রী সহ ও পৌত্র-পৌত্রী সমেত তাকে দেখতে পায়। মেহেরউন্নীসা সারা জীবন ধরে যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করেছিল স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ গল্পের শেষ বাক্যে এই ঘটনাটিকে নিছক কল্পনা বলে চিহ্নিত করেছেন। দার্জিলিঙে গিয়ে মেঘমেদুর আবহাওয়ায় বৃষ্টিস্নাত প্রভাতে ক্যালকাটা রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এরকম একটি গল্পের প্লট তাঁর মাথায় এসেছিল। "আমার বিশ্বাস, আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখন্ড রচনা করিয়াছিলাম। সেই মুসলমান ব্রাহ্মণী, বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই হয়তো সত্য নহে।"[১৮] তাই কল্পনা বা স্বপ্ন যাই হোক না কেন এই গল্পের মধ্যে তৎকালিক যে আর্থসামাজিক বা বিষম সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে ওঠে তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর এইখানেই একটি অপ্রাকৃত গল্প সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে।

সীতা দেবীর ‘পুণ্যস্মৃতি’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ‘কঙ্কাল’ গল্পের বীজ দেখতে পাওয়া যায়। লেখিকা রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনুলিপিতে লিখেছেন — "ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম তাতে একটি মেয়ের skeleton ঝুলানো ছিল। .... একদিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তারা আমাদের ঘরে শোবেন, আমার ওপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেকদিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। .....আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, ‘আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল? আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?’ ক্রমে মনে হতে লাগলো সে যেন দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বনবন করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে।"[১৯]

‘জীবিত ও মৃত’ গল্পে জীবিত কাদম্বিনী সংসারের কাছে পরিত্যাজ্য হয়েছে জেনেও আবার পুরনো সংসারে ফিরতে চাইল। খোকার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা তাকে আবার শারদাশঙ্কর বাবুর গৃহে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করল। কিন্তু সংসারের কাছে এসে মৃত পরিগণিত হওয়ায় জীবিত কেউই তাকে গ্রহণ করতে পারল না। শেষে পুকুরে আত্মবিসর্জন দিয়ে সে সত্যিই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

হতভাগিনী কাদম্বিনীর মনস্তত্ত্ব ও মানসিক টানাপোড়েন তাকে জীবিত থেকে মৃত মনে করতে বাধ্য করায়— "প্রথমে মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনই ভাবিল, আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমার প্রেতাত্মা।"এই প্রেতাত্মাবোধই কাদম্বিনীকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অবশেষে সইয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েও তার শঙ্কা গেল না। বাড়ির লোকও তাকে প্রেতাত্মাই ভেবেছে। তাই তাকে চরম পথটি বেছে নিতে হলো। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'।[২০]

ভৌতিক ব্যাপার অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন, অধিকাংশ মানুষ করেন না, রবীন্দ্রনাথ এই সংশয়ের কথা সম্যক উপলব্ধি করতেন। তাঁর মনোভাব তাই আত্মরক্ষামূলক দ্বিধায় কম্পমান। যুক্তিবাদী মানুষ অতিপ্রাকৃতে

বিশ্বাস নাও করতে পারে, তাই অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিকে বাস্তবতার ফ্রেমে লিপিবদ্ধ করেছেন, গল্পের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করে পরিসমাপ্তিতে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করেছেন। এমনই একটি গল্প 'মণিহারা'। মণিমালিকার কঙ্কাল— "সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তক অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝকঝক করিতেছে।"[২১] উপসংহারে গল্পটি অতিপ্রাকৃতের রহস্যলোক থেকে আকস্মিক চমকে বাস্তবে উপস্থিত হল- গল্পের নীরব শ্রোতাই আসলে ফণিভূষণ সাহা।

'ঘাটের কথা' গল্পটির গৃহবধূটির আত্মগ্লানি ও তার প্রতি গুরুদেবের অবৈধ কৃপা ও কুদৃষ্টি গৃহত্যাগে বাধ্য করে। ঘাটের যে লোকটি লেখককে গল্পটি শোনায় আসলে সে তার স্বামীই, অথচ চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটির আর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। চোখের নিমিষে মিলিয়ে যায়।[২২] রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী এক অপরূপ ভারসাম্যের জগতে স্থাপন করেছেন। পাগলা মেহের আলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুটা হায়, সব ঝুটা হায়'। এই সতর্কবাণী শুনেও আমরা এই অপ্রাকৃত বা ভৌতিক রহস্যলোক থেকে সরে আসতে পারি না। এই অতিপ্রাকৃতের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ বোধ করতে থাকি। যা অনিবার্যভাবে "অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায়"[২৩]

-এই রহস্য বৃত্তের চতুর্দিকে আমরাও ঘুরতে থাকি। তাই ভৌতিক বা অপ্রাকৃত গল্পের প্রতি আমাদের এই অনিবার্য আকর্ষণ!

ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি আলোচনার পরে একথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গল্পের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে, মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, আজকের প্রযুক্তি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে , নক্ষত্র জগতের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে, সেই ছবি

বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস, সৌরজগতের অবস্থান, গ্রহণ, ঝড়-বৃষ্টি ভূমিকম্প সম্বন্ধে আগাম বার্তা দিতে পারছেন। উপগ্রহের মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থারও আশ্চর্য রকম উন্নতি হয়েছে, এক কথায় পৃথিবীর রহস্য আমাদের হাতের আয়ত্তে এসেছে তবুও ভূতের গল্পের আকর্ষণ কিন্তু এতটুকু কমেনি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভূতেরা যেসব জায়গায় বাস করত যেমন, হানাবাড়ি, শেওড়া গাছ, জলাভূমি, সবই তো নিশ্চিহ্ন। মানুষের আবাসের ও রুজি রোজগারের প্রয়োজনে ভূমির উপর অত্যধিক চাপ বেড়েছে, প্রোমোটারদের কল্যাণে ভূতেদের ভিটে-মাটি প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গেছে। ভূতেদের আস্তানায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে গগনচুম্বী হাইরাইজ অট্টালিকা বা আবাসন, তবে কি ভূতেরা আজ বাস্তুচ্যুত?

আসলে সত্যি কথাটা হলো, যতদিন মানুষ আছে ততদিন ভূতেরাও থাকবে। ভূত থাক বা না থাক, যতদিন ভূতের ভয় থাকবে ভূতের গল্পও থাকবে। এই জন্যই স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা ভূতের গল্প লিখেছেন। একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, গীতিকাব্য যা-ই লেখা হোক না কেন ভূতের গল্পের চাহিদা অফুরন্ত। বিগত কয়েকটি বছরের বাংলা বইয়ের বিক্রি বা কাটতিতে সবচেয়ে আগে ভূতের গল্পের চাহিদা, এমনকি প্রত্যেক বছরই ভূতের গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সেই সংকলনে প্রথিতযশা লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে নবীন লেখকদের লেখায় আকর্ষণীয় ভূতের গল্পও সংযুক্ত হয়েছে। এই সংকলনগুলি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী। তাই ভূতের গল্প বা কাহিনী যথেষ্ট জনপ্রিয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভুতের গল্পের ভান্ডার যেন এক রত্নখনি!

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হন্টিং বা ভৌতিক বিষয় নিয়ে গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। আজকের দ্রুতগামী প্রযুক্তিময় জীবনেও এই গবেষণাগুলি অন্যতর এক জীবনের সন্ধান দেয়। অন্ততঃ দুইটি গবেষণার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ‘নাসা’র প্রাক্তন পদার্থবিজ্ঞানী

ডক্টর হাইনেম্যান এবং থিওজফির প্রফেসর ডক্টর লেডউইথ -এর 'দা অর্ব প্রজেক্ট' অলৌকিক বা ভৌতিক বিষয় নিয়ে চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। জার্মানির টেকনিশে ইউনিভার্সিটির মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে গবেষণাও বেশ চাঞ্চল্যকর। বিজ্ঞান ও অন্বেষণের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রকৃতির অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সমুদ্রের সম্ভাব্য গভীরতা, ঘনবর্ষণ বনাঞ্চলের জটিলতা, মানব মস্তিষ্কের গঠন, পূর্ণ ক্ষমতা ও বৈচিত্র্য এবং মহাজাগতিক রহস্য, ভয়ঙ্করের মধ্যে সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের বুকে ভয়ংকর ও বিস্ময়--জানার চেয়ে অজানার পরিমাণ অধিক! প্রকৃতিকে যত গভীরে অধ্যয়ন করি না কেন, ততই নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। আশ্চর্যজনক আবিষ্কার, ব্যাখ্যাতীত ঘটনা পৃথিবীর সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, আমাদের ঘিরে থাকা সীমাহীন বিস্ময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক কাহিনী মানুষের অন্বেষণ ও বিস্ময়কে জানার প্রয়াস মাত্র।।[২৪]

গ্রন্থসূত্র-

১) নৈনং ছিন্দতি শাস্ত্রাণি, নৈনাং দহতি পাবক, ন চৈনং ক্লেদয়ান্ত্যাপোন শোষয়তি মারুত।।

জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী অনুদিত, পৃ ২৩

২) দাস, সৌভিক, পৃষ্ঠা ১০

৩) সেনগুপ্ত, সায়ন্তনী, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮

৪) সেন দাস, ব্রততী, পৃষ্ঠা, ৭৭,৭৮

৫) ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ১২২-২৬

৬) ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, পৃষ্ঠা ১০-১১

৭) পরশুরাম, পৃষ্ঠা ২৪-২৮

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

৮) মুখোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ, পৃষ্ঠা, ১১৯-১২৮

৯)বসু, মনোজ, পৃষ্ঠা ৬৭-৭২

১১)মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৪০-১৫২

১২)ঘোষ, বারিদবরণ , পৃষ্ঠা ৭৭- ৮২

১৩)মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১২০-১২৪

১৪) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯

১৫) বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, পৃষ্ঠা ১৫১-৫২

১৬) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৬০

১৭) পুততন্ডু, সায়ন্তনী, পৃষ্ঠা ৪৫-৫৭

১৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৮

১৯) দেবী, সীতা, পৃষ্ঠা ১৯-২১

২০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩১৭

২১) ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩১১

২২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৪২১

২৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩১৮

২৪) দাস, সৌভিক, পৃষ্ঠা ২৪-২৫

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

গ্রন্থপঞ্জী-

১) নৈনং ছিন্দতি শাস্ত্রাণি, নৈনাং দহতি পাবক, ন চৈনং ক্লেদয়ান্ত্যাপোন শোষয়তি মারুত।।

জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী অনুদিত। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় অধ্যায়, ১৩৭১।

২) দাস, সৌভিক। *ভারতের রহস্যময় ভূতুড়ে বাড়ি।* কলকাতা, বর্তমান সাপ্তাহিক, ১৯ আগস্ট, ২০২৩।

৩) সেনগুপ্ত, সায়ন্তনী। *রাজকন্যা রত্নাবতী ও ভানগড় দুর্গ,* ভ্রমণ পত্রিকা শারদীয়া, ১৪৩০, কলকাতা, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী,

৪) সেন দাস, ব্রততী, *পাহাড়ী গ্রাম ও একটি ভূত বাংলো।* সুখী গৃহকোণ পত্রিকা, ১ মে কলকাতা, সম্পাদক অন্বেষা দত্ত, ২০২৩।

৫) ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। *রচনা সমগ্র দ্বিতীয় খন্ড।* কলকাতা, লালমাটি প্রকাশন, ১৪৩০।

৬) ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য। *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।* ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা,১৩৯৩।

৭) পরশুরাম। *পরশুরামের গল্প সমগ্র। ভূশণ্ডীর মাঠে,* কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা,২০২৩।

৮) মুখোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ। *ভূতের বাড়ি, ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী।* কলকাতা, কামিনী প্রকাশনালয়, ২০২২।

৯) বসু, মনোজ। *ভুত মরে পাঁঠা, মনোজ বসু গল্প সমগ্র।* করুণা প্রকাশনী, ২০১৮।

১০) বিশী, প্রমথনাথ। *সরস গল্প।* করুণা প্রকাশনী, ২০১৫।

১১) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সম্পাদিত। *মানুষ থাকলে ভূতও থাকে।* দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০১০।

১২) ঘোষ, বারিদবরণ। *সেরা পঞ্চাশ ভৌতিক গল্প সংকলন।* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭।

১৩) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সম্পাদিত। *সেরা ভৌতিক সংকলন,* কলকাতা, মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, ২০২২।

১৪) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *২৫ টি অলৌকিক গল্প।* কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০২১।

১৫) বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *ডাইনি ভৌতিক অমনিবাস।* কলকাতা, আদিত্য পাবলিশার্স, ২০২৩।

১৬) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সম্পাদিত। *শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প বিলাপীর কান্না।* মঞ্জিল সেন, কলকাতা, কামিনী প্রকাশনালয়, ২০১৭।

১৭) পুততন্ডু, সায়ন্তনী। *তৃষ্ণা।* ১লা আগস্ট, কলকাতা, সম্পাদক হিমাংশু সিংহ, ২০২২।

১৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ, দুরাশা, রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্থ খন্ড।* বিশ্বভারতী, কলকাতা,

১৯) দেবী, সীতা। *পুণ্যস্মৃতি।* নবভারত পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৩৬৭।

২০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ, জীবিত ও মৃত, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী নবম খন্ড।* বিশ্বভারতী।

২১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ, মনিহারা, রবীন্দ্র রচনাবলী ১১ খন্ড।* বিশ্বভারতী।

২২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ, ঘাটের কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খন্ড।* বিশ্বভারতী।

২৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গল্পগুচ্ছ, ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খন্ড।* বিশ্বভারতী।

২৪) দাস, সৌভিক। *ভারতের রহস্যময় ভূতুড়ে বাড়ি।* কলকাতা, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৯ আগস্ট, ২০২৩।